পল্টন ট্রাজেডি

রক্তাক্ত ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ মানবতাবিরোধী অপরাধ। ঠিক ৪ বছর আগে ২০০৬ সালের এই দিনে এ দেশের রাজনীতির ইতিহাসে এক কলংকজনক অধ্যায় রচিত হয়। প্রকাশ্য দিবালোকে লগি-বৈঠা দিয়ে তরতাজা তরুণদের পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে নারকীয় উল্লাস চালানো হয়েছিল। সবচেয়ে বড় মানবতা বিরোধী অপরাধ এদিনই সংগঠিত হয়েছিল।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট সেদিন জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের উপর পৈশাচিক হামলা চালিয়েছে ইতিহাসে তা নজিরবিহীন। লগি, বৈঠা, লাঠি, পিস্তল ও বোমা হামলা চালিয়ে যেভাবে মানুষ খুন করা হয়েছে তা মনে হলে আজও শিউরে ওঠে সভ্য সমাজের মানুষ। সাপের মতো পিটিয়ে মানুষ মেরে লাশের উপর নৃত্য উল্লাস করার মতো ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন। এ ঘটনা শুধু বাংলাদেশেই নয়, গোটা বিশ্বের বিবেকবান মানুষের হৃদয় নাড়া দিয়েছে। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব থেকে শুরু করে সারাবিশ্বে ওঠে প্রতিবাদের ঝড়।

২৮ অক্টোবরের পৈশাচিকতার বিচার হওয়াতো দূরের কথা, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মামলাই প্রত্যাহার করে নেয়া হয়েছে। দেশের বিশিষ্টজনেরা এর তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, ২৮ অক্টোবরের পৈশাচিকতা ছিল নজীরবিহীন। যারা এর সাথে জড়িত তাদের বিচার অবশ্যই হওয়া উচিত। এর বিচার না হওয়া পর্যন্ত জাতি কলংক মুক্ত হবে না। তারা মনে করেন, সেই তাণ্ডবতার বিচার হলে নাটোরের উপজেলা চেয়ারম্যানকে এভাবে মরতে হতো না। তারা বলেন, মামলা প্রত্যাহার করার মাধ্যমে বিচার পাওয়ার অধিকারও কেড়ে নেয়া হলো।

এতেই প্রমাণ হয় এই হত্যাকাণ্ডটি ছিল সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। হত্যার রাজনীতিকে উৎসাহিত করার পরিণতি কারো জন্যই শুভ নয়।

২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় বিদায়ী প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রেডিও-টিভিতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন। মূলত এ ভাষণ শেষ হওয়ার পরপরই দেশব্যাপী শুরু হয় লগি-বৈঠার তাণ্ডব। বিভিন্ন স্থানে বিএনপি-জামায়াত অফিসসহ নেতাকর্মীদের বাড়ি বাড়ি যেমন চালানো হয় পৈশাচিক হামলা, তেমনি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় অনেক অফিস, বাড়িঘর, পুরো দেশব্যাপী চলে তাণ্ডবতা। তার প্রথম শিকার হয় গাজীপুরে জামায়াতে ইসলামীর অফিস। এসময় লগি-বৈঠা বাহিনীর তাণ্ডবে শহীদ হন রুহুল আমিন। সুপরিকল্পিত হামলা চারদলীয় জোট সরকারের ৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগরীর উদ্যোগে ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর বিকাল ৩টায় বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে পূর্ব নির্ধারিত সমাবেশ ছিলো। সকাল থেকেই সভার মঞ্চ তৈরির কাজ চলছিল। হঠাৎ করেই বেলা ১১টার দিকে আওয়ামী লীগের লগি, বৈঠা ও অস্ত্রধারীরা জামায়াতের সমাবেশ স্থলে হামলা চালায়। তাদের পৈশাচিক হামলায় মারাত্মকভাবে আহত হয় জামায়াত ও শিবিরের অসংখ্য নেতা-কর্মী। তাদের এই আক্রমণ ছিল সুপরিকল্পিত ও ভয়াবহ। তারা একযোগে বিজয়নগর, তোপখানা রোড ও মুক্তাঙ্গন থেকে পল্টন মোড় দিয়ে আক্রমণ চালায়। এক পর্যায়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা পল্টনের বিভিন্ন গলিতে ঢুকে পড়ে এবং নিরীহ জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীদের বেধড়ক পেটাতে থাকে। পল্টন মোড়ের পৈশাচিকতা সেদিন পুরো পল্টন জুড়ে ছিল লগি, বৈঠা বাহিনীর তাণ্ডবতা। লগি-বৈঠা আর অস্ত্রধারীদের হাতে একের পর এক আহত হতে থাকে নিরস্ত্র জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা। তারা শিবির নেতা মুজাহিদুল ইসলামকে লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে। লগি-বৈঠা দিয়ে একের পর এক আঘাত করে নির্মমভাবে হত্যা করে জামায়াত কর্মী জসিম উদ্দিনকে। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তারা তার লাশের উপর ওঠে নৃত্য-উল্লাস করতে থাকে।

টার্গেট ছিলো নেতৃবৃন্দ সেদিন আওয়ামী লীগের লগি-বৈঠা বাহিনী শুধু জামায়াতের সভা পণ্ড করার জন্যই পৈশাচিক হামলা চালায়নি, তারা জামায়াতকেই নেতৃত্বশূন্য করতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল জামায়াতের সভামঞ্চে আগুন ধরিয়ে দিতে। প্রথম দফা হামলার পর তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিতে থাকে। আশপাশের ভবনের ছাদে উঠে বোমা ও বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্রসহ অবস্থান নেয়। সভার শেষ দিকে মাওলানা নিজামীর বক্তব্য শুরু হলে তারা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পুনরায় হামলা চালায়। একদিকে ভবনের ছাদ থেকে বৃষ্টির মতো বোমা বর্ষণ করতে থাকে। অপরদিকে পল্টন মোড় থেকে গুলী ছুঁড়তে ছুঁড়তে লগি-বৈঠাধারীরা সমাবেশের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এসময় জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা তৈরী করে মানব ঢাল। আওয়ামী অস্ত্রধারীদের ছোঁড়া গুলী মাথায় বিদ্ধ হয়ে রাজপথে লুটিয়ে পড়েন জামায়াত কর্মী হাবিবুর রহমান ও জুরাইনের জামায়াত কর্মী জসিম উদ্দিন। এ ঘটনায় জামায়াত ও শিবিরের ৬ জন নেতাকর্মী শহীদ এবং আহত হন সহস্রাধিক।

হামলা ছিল একতরফাঃ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে বিকেলে সমাবেশের জন্য সকাল থেকেই মঞ্চ তৈরির কাজ চলছিল। এ জন্য মঞ্চ তৈরির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাসহ জামায়াত ও শিবিরের কয়েকজন নেতাকর্মী মঞ্চের পাশে ছিল। এ সময় ১৪

দলের নেতাকর্মীরা জিরো পয়েন্ট এলাকায় অবস্থান করছিলো। তাই জামায়াত ও ১৪ দলের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি অবস্থানের কোন সুযোগ ছিল না। বিকেলে সমাবেশ হওয়ার কারণে সকালে মঞ্চ তৈরির সংশ্লিষ্ট লোক ছাড়া মিছিল করার মতো জামায়াত ও শিবিরের কোন নেতাকর্মী ছিলো না। হঠাৎ করেই সকাল ১১টার দিকে আওয়ামী লীগ নেতা হাজী সেলিমের নেতৃত্বে লালবাগ থানা আওয়ামী লীগ লগি-বৈঠা হাতে বিশাল মিছিল নিয়ে পল্টন মোড়ে আসে। একই সময় এডভোকেট সাহারা খাতুনের নেতৃত্বে বিজয় নগর থেকে আরেকটি মিছিল পল্টন মোড়ে আসে। এসময় তারা একযোগে ধর ধর বলে জামায়াত ও শিবিরের কর্মীদের ওপর হামলা চালায়। জিপিও এলাকায় অবস্থানরত ১৪ দলের শত শত কর্মী লগি-বৈঠা নিয়ে তাদের সাথে যোগ দেয়। ১৪ দলের কর্মীরা প্রকাশ্যে গুলী করা ছাড়াও লগি-বৈঠা নিয়ে জামায়াত-শিবিরের কর্মীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একের পর এক আঘাত হানতে থাকে নিরীহ জামায়াত ও শিবিরের কর্মীদের ওপর। মঞ্চ গুঁড়িয়ে দিতে এগিয়ে যেতে থাকে বায়তুল মোকাররম উত্তর সড়কের দিকে।

এ হামলায় পিস্তলসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ডা. এইচবিএম ইকবালও তার বাহিনী নিয়ে যোগ দেয়। সেদিন বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত ভিডিও ফুটেজ থেকে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ নেতা ডা. ইকবাল সেদিন পল্টন মোড় থেকে একটু এগিয়ে বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) অফিসের সামনে তার অনুগত একদল যুবককে হাত নেড়ে সামনে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছে। ডা. ইকবাল হাত নেড়ে নির্দেশ দেয়ার পরই এক যুবককে ঘেরাও করে লগি-বৈঠা বাহিনী নির্মমভাবে পিটাতে থাকে। চতুর্দিক থেকে আঘাতে আঘাতে সে পড়ে যায় রাস্তার কিনারে। সাপের মতো লগি-বৈঠা দিয়ে তাকে পিটানো হয়। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর তার লাশের ওপর উঠে নারকীয় উল্লাস করে লগি-বৈঠা বাহিনী। বিকল্প পথে মঞ্চ দখলের জন্য বিজয়নগর, পল্টন মসজিদের গলি দিয়ে ঢুকে পড়ে লগি-বৈঠা বাহিনী। যেখানেই দাড়ি টুপিধারী মানুষ দেখেছে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা। শিবির নেতা মুজাহিদুল ইসলামকে তারা এ সময় পেয়ে যায় পল্টন মোড়ের কাছে। ঘিরে ধরে তাকে। লগি-বৈঠা দিয়ে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে নরপিশাচরা। আঘাতে আঘাতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মুজাহিদ। তারপর ঐ পিশাচরা লগি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করে। লালবাগের জসিমকে প্রীতম হোটেলের সামনে একাকী পেয়ে লগি-বৈঠা দিয়ে বেধড়ক মার ধর করা হয়। তিনি বারবার উঠে দাড়াতে চেষ্টা করেন। এ দৃশ্যই টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখা যায়। আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসীদের মুহুর্মুহু গুলীবর্ষণ,বোমা ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের পর আহতদের সারি বেড়েই চলছিল। আহতদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় জামায়াতের ঢাকা মহানগরী অফিসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। গুরুতর আহতদের নগরীর বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়া হয়। দফায় দফায় হামলা চলে দুপুর ২টা পর্যন্ত। এ সময় বারবার পুলিশকে অনুরোধ করা হলেও তারা রাস্তার পাশে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অনেক পুলিশকে সেদিন বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর চত্বরের ভিতরে অবস্থান নিতে দেখা যায়। দুপুর পৌনে ২টার দিকে ১৪ দলের লগি-বৈঠাধারী সন্ত্রাসীরা হামলা জোরদার করে পল্টন মোড় থেকে সিপিবির অফিসের সামনে চলে আসে। এ সময় তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া কয়েকজন জামায়াত ও শিবিরের নেতা-কর্মীদের ধরে নিয়ে যায়। পুলিশ কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও তারা কোন ভূমিকা পালন করেনি। একই সময় বিজয়নগর, পুরানা পল্টন মসজিদ গলিসহ আশপাশের এলাকা দিয়ে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে থাকে। তারপরও সমাবেশ সফল হলো বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বায়তুল মোকাররমের উত্তর সড়কে জামায়াতের সমাবেশ শুরু হয়। এ সময় পল্টন মোড়ের দিকে না হলেও বিজয়নগরসহ অন্যান্য এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে চোরাগোপ্তা হামলা চালাতে থাকে লগি-বৈঠা বাহিনী। তবে সমাবেশ চলতে থাকে স্বাভাবিকভাবে। যথারীতি আসর নামাযের বিরতি হয়। বিরতির পর বক্তব্য রাখেন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবদুস সুবহান, সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। সভাপতি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগরী আমীর মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান। এরপরই বক্তব্য দিতে দাঁড়ান জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।

মাওলানা নিজামীর বক্তব্য শুরু হওয়ার ৪/৫ মিনিট পর ৪টা ৪৩ মিনিটে পল্টন মোড়ে উত্তেজনা দেখা যায়। এ সময় নির্মাণাধীন র‍্যাংগস টাওয়ারের (বাসস ভবনের পূর্ব পাশের বিল্ডিং) ছাদ থেকে সমাবেশ লক্ষ্য করে ১০/১২টি বোমা ও প্রকাশ্যে অস্ত্র উঁচিয়ে দফায় দফায় গুলী ছুঁড়ে ১৪ দলের সন্ত্রাসীরা। এ সময় পুলিশ নিজেদের নিরাপদ স্থানে হটিয়ে নেয়। আবার শুরু হয় ১৪ দলের মরণ কামড়ের মতো আক্রমণ। সমাবেশ ভণ্ডুল করে দেয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। মাগরিবের আযানের পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে আসে যখন বিডিআর পল্টন মোড়ে অবস্থান নেয়। এর আগে সমাবেশের কোন বক্তাই উত্তেজনাকর বক্তব্য দেননি, আক্রমণাত্মক কথাও বলেননি কেউ।

লাশ নিয়ে রাজনীতিঃ সেদিন আওয়ামী হায়েনারা জামায়াত কর্মী হাবিবুর রহমানকে পৈশাচিক কায়দায় হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি লাশটি টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল গুম করার জন্য। কিন্তু পুলিশের সহায়তায় যখন লাশটি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হলো সেখানেও চলতে থাকে আওয়ামীলীগ নেতা হাজী সেলিম বাহিনীর লাশ দখলের খেলা। তারা নকল বাবা মা সাজিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল লাশটি। পরবর্তীতে এ কারসাজি ধরা পড়ায় নকল বাবা মা সটকে পড়ে। এখানেই শেষ নয়। আওয়ামী লীগ হাবিবুর রহমানকে নিজেদের কর্মী দাবী করে তার লাশের ছবি ব্যবহার করে পোস্টারও ছেপেছিল। লাশ নিয়ে রাজনীতি এর চেয়ে জঘন্য নমুনা আর কী হতে পারে?

পুলিশের রহস্যজনক ভূমিকাঃ ঘটনার শুরু থেকেই পুলিশের ভূমিকা ছিল রহস্যময়। পুলিশের উপস্থিতিতেই আওয়ামী লীগের আগ্নেয়াস্ত্র ও লগি-বৈঠাধারী সন্ত্রাসীরা জামায়াতের সমাবেশ স্থলে হামলা চালায়। এ সময় পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অসহায় জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীদের শত অনুরোধেও পুলিশ কোন ভূমিকা রাখেনি। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের ভূমিকাও ছিল রহস্যজনক।

২৮ অক্টোবরের আগ থেকেই পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার ঘোষণা করা হচ্ছিল, লগি-বৈঠা, কাস্তে বা অন্য কোন অস্ত্রশস্ত্র বহন নিষিদ্ধ ও বেআইনী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কিন্তু পুলিশ এ ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়নি। আওয়ামী লীগের অফিসে লগি, বৈঠা সংরক্ষণ করা হচ্ছে বলে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেল সচিত্র প্রতিবেদন প্রচার করলেও পুলিশ এ ব্যাপারে ছিল একেবারেই নীরব।

বেগম জিয়ার উদ্যোগঃ জামায়াতে ইসলামী তাদের পূব নির্ধারিত সমাবেশ করে বিকেলে। সমাবেশ শেষ হওয়ার পরও নারকীয় আক্রমণ চলতে থাকে। একটা পর্যায়ে শত শত নেতাকর্মী অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সন্ধ্যার পর আক্রমণের ভয়াবহতা বাড়ার আশংকায় শংকিত হয়ে ওঠেন তারা। এরপর জামায়াত নেতৃবৃন্দ বাধ্য হয়েই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুরো বিষয়টি তাকে অবহিত করানো হয়। তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগী হয়েই বিডিআরকে ঘটনাস্থলে আসার কথা বলেন। বিডিআর ঘটনাস্থলে আসার পরই পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। সেদিন বিডিআর ঘটনাস্থলে না আসলে কী ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হতো, তা মনে করে এখনো অনেকেই নিজের অজান্তেই আঁতকে ওঠেন।

লগি-বৈঠা নিয়ে ঢাকা অবরোধের নির্দেশঃ ২০০৬ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশ থেকে আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার কর্মীদের লগি-বৈঠা নিয়ে ঢাকা অবরোধের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তারা এই আহ্বানে সাড়া দিয়েই আওয়ামীলীগসহ ১৪ দলের কর্মীরা লগি-বৈঠা ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ২৭ অক্টোবর থেকেই ঢাকাসহ সারাদেশে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। সে দিনও মুক্তাঙ্গনে আওয়ামীলীগের সভাস্থল থেকে বারবার ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল, "জামায়াত শিবিরের উপর হামলা কর" ওদের খতম কর"। ১৪ দলীয় জোট ও আওয়ামীলীগ নেতা আবদুল জলিল, তোফায়েল আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, হাসানুল হক ইনু, রাশেদ খান মেনন বারবার উত্তেজনাকর বক্তব্য দিয়ে হামলার জন্য তাদের সন্ত্রাসী বাহিনীকে উৎসাহিত করছিলেন।

অধিকতর তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণঃ ঘটনার পরদিন জামায়াতে ইসলামীর পল্টন থানার তৎকালীন আমীর এ.টি.এম সিরাজুল হক বাদী হয়ে পল্টন থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলায় আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলের ৪০ জন নেতার নামসহ সহস্রাধিক ব্যক্তিকে আসামী করা হয়। ২০০৭ সালের ১১ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে পলাতক আসামী হিসেবে উল্লেখ করে ৪৬ জন আওয়ামী লীগ ও ১৪ দলীয় নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট দাখিল করা হয়। চার্জশীট দাখিলের পর ২২ এপ্রিল ২০০৭ মামলার চার্জশীট গ্রহণ করেন মহানগর হাকিম মীর আলী রেজা। চার্জশীট গ্রহণ করেই আদালত পলাতক আসামী শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করে। পরদিন ২৩ এপ্রিল তদন্ত কর্মকর্তার নাটকীয় আবেদনের প্রেক্ষিতে পরোয়ানা স্থগিত করে মামলাটি অধিকতর তদন্তের নির্দেশ দেন মহানগর হাকিম মীর আলী রেজা। সেই থেকে অধিকতর তদন্তের নামে তিন বছর পার করে দেয়া হয়।

পুরো মামলাই প্রত্যাহারঃ ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর তাদের দলীয় নেতাকর্মী, সমর্থক ও শুভাকাংখীদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে গত ৯ জুলাই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব আবু সাঈদ জনস্বার্থে পল্টন থানায় দায়ের করা হত্যা মামলাটি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ঢাকা জেলা প্রশাসককে একটি পত্র দেয়। ১৭ আগস্ট আদালত মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করে। আইন অনুযায়ী যেকোন হত্যা মামলা বাদীর সম্মতি ছাড়া প্রত্যাহার করার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও মহাজোট সরকার তাই করেছে। আইন বিশেষজ্ঞগণ বলছেন, কোন হত্যাকাণ্ডের মামলাই রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করার সুযোগ নেই। যদি কোন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত করা হয়েও থাকে তদন্ত শেষে আদালতই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

বিচার একদিন হবেই: শহীদ পরিবারের আশা ৪ বছর পার হওয়ার পরও কোন বিচার না হওয়ায় শহীদ মাসুমের মা শামসুন্নাহার রুবি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়, সবাইকে আইন মানতে হবে। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে তাদের বিরুদ্ধের সব মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে আমি আশা ছাড়িনি। এর বিচার এক দিন না একদিন হবেই। শহীদ গোলাম কিবরিয়া শিপনের মা মাহফুজা বেগম বলেন, মানুষকে আর যেন এভাবে সাপের মতো পিটিয়ে হত্যা হতে না হয়। আর যেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে না হয়। শহীদ জস(চাঁদপুর) স্ত্রী নারগিস আক্তারের একটাই কথা, বিচার কার কাছে চাইবো। জালেম কখনও এর বিচার করতে পারে না। আর এ সরকার যতদিন আছে, তার বিচার হবে না।